॥ ১ ॥

বিবিধ সংগ্রহ

প্রশান্ত সাগরের কয়েকটি মরুদ্বীপ

জীবনশক্তির কার্য আলোচনা করিতে গিয়া জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই শক্তির নানা অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ অবলোকন করিয়াছেন ও তাঁহাদের অনুসন্ধান প্রতিদিন তাঁহাদিগকে নব নব রহস্যের সম্মুখীন করিতেছে। ডারউইনের প্রসিদ্ধ নৌযাত্রার সময় হইতেই মহাসমুদ্রের মধ্যস্থ দ্বীপ সকল এই দৈবশক্তির প্রকৃতি পরীক্ষা করিবার ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে, ইহার বিশেষ কারণ এই যে, একই শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদ বিভিন্ন আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে পড়িয়া স্ব স্ব আকৃতি ও অভ্যাস কিরূপ বদলাইয়া ফেলিয়াছে—তাহা বুঝিতে হইলে মহাদেশের উপকূল হইতে দূরবর্তী সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বীপপুঞ্জের প্রাণী ও উদ্ভিদের পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ক্যালিফোর্নিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলবর্তী বহু দ্বীপ এরূপ প্রাণীতে পরিপূর্ণ, যাহাদের পূর্বপুরুষগণ বহুকাল পূর্বে ভাসমান কাষ্ঠ, সামুদ্রিক শৈবাল, ভগ্ন জাহাজের টুক্‌রা প্রভৃতি অবলম্বনে ঐ সকল জনশূন্য দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ঐ সকল দ্বীপগুলির প্রায় সমুদয়ই মনুষ্য-বসতিশূন্য অনুর্বর ও রুক্ষ। অনেক দিন হইতে জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এই সকল দ্বীপে পড়িয়াছে, এবং নানাদিক হইতে দ্বীপস্থ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের উৎপত্তি, বিচার ও তাহার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টার ফলে দৈবশক্তির নূতন নূতন ক্রিয়া গোচরীভূত হইতেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় পশ্চিমোপকূলের অদূরে এরূপ বহু দ্বীপ আছে। এই সকল স্থানে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না, হইলেও এত কম হয় যে জমির অনুর্বরতা ঘোচে না। গুয়াডেলুপ্ দ্বীপ এই দ্বীপগুলির অন্যতম এবং কোনো দিক হইতেই ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলবর্তী ভূভাগের সহিত কোনো সংযোগ না থাকাতে ইহা প্রকৃতপক্ষে সামুদ্রিক দ্বীপ। অথচ এই দ্বীপের তাবৎ প্রাণী ও উদ্ভিদ্ ক্যালিফোর্নিয়া হইতেই আসিয়াছে। সারা দ্বীপটি কোনো সুদূর অতীতে আগ্নেয় শক্তির তাড়নে নীল মহাসমুদ্রগর্ভ হইতে সহসা জন্মলাভ করিয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়—প্রকৃতপক্ষে দ্বীপের উত্তর ভাগ একটি অধুনা-নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির অংশ মাত্র, সমুদ্র জল হইতে প্রায় ৪৫০০ ফুট খাড়া, গলিতধাতু প্রস্তরের দেওয়াল এরূপভাবে দণ্ডায়মান যে সেদিক হইতে দ্বীপে উঠিবার কোনো উপায় নাই। যে সব প্রাণী একবার এখানে আসিয়া পড়িয়াছিল, ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে ফিরিবার তাহাদের আর সুযোগ ঘটে নাই, বহুকাল ধরিয়া নূতন স্থানের নূতন অবস্থার মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া তাহাদের বহু পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে—যেগুলি জীবতত্ত্বের দিক হইতে বিশেষ অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়।

পূর্বে গুয়াডেলুপের সমুদ্রকূলে একজাতীয় লোমশ শিল বাস করিত ; প্রশান্ত মহাসাগরের অন্য কোন স্থানে সে জাতীয় শিল দেখিতে পাওয়া যাইত না। ইহার লোমশ চর্ম অত্যন্ত মূল্যবান, সেজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই তিমি-শিকারী দলের জাহাজ এ অঞ্চলে যাতায়াত শুরু করে এবং ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থলোলুপ তিমি-শিকারীর দল জাহাজের পর জাহাজ পাঠাইয়া এই নিরীহ প্রাণীদিগকে লোমের জন্য অবাধ হত্যা করিয়া প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের চর্ম এখান হইতে সংগ্রহ করে। ফলে ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের পর উক্ত জাতীয় শিলের বংশে বাতি দিতে কেহ অবশিষ্ট ছিল না। বর্তমানে গুয়াডেলুপ ও নিকটস্থ কয়েকটি দ্বীপে অন্য এক জাতীয় অতিকায় শিল বাস করে, হয়-তো সেগুলিকেও ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ গবর্ণমেন্ট আইন করিয়া উহাদের হত্যা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা না করিলে এতদিন সে জাতীয় শিলও টিঁকিত কি না সন্দেহ।

কয়েক বৎসর পূর্বে উপকূলবর্তী প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য আমেরিকার কয়েকটি বিভিন্ন সমিতি একদল বৈজ্ঞানিককে গুয়াডেলুপ দ্বীপে প্রেরণ করেন। তাঁহারা গিয়াই প্রথমে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন যে লোমশ শিলের বংশে বর্তমানে কেহ কোথাও অবশিষ্ট আছে কি না। কিন্তু কয়েক দিন ধরিয়া নানা সম্ভব-অসম্ভব স্থান খোঁজাখুঁজি করিবার পর তাঁহারা বুঝিলেন লোমশ শিলের শেষ বংশধরকে কসাইদিগের ছুরি হইতে উদ্ধার করিতে তাঁহাদের যে সময়ে আসা উচিত ছিল তদপেক্ষা চল্লিশ বৎসর পরে তাঁহারা আসিয়াছেন।

দ্বীপের কয়েকটি স্থানের বিশেষ চিহ্ন পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারেন সেই সেই স্থানে লোমশ শিলের সুবৃহৎ দল সমুদ্রতীরে শয়ন করিয়া থাকিত ; স্থানগুলি পরিমাপ করিয়া তাঁহারা অনুমান করেন যে, সমগ্র দ্বীপটিতে প্রথম অবস্থায় প্রায় দশ লক্ষ লোমশ শিলের আবাসভূমি ছিল। দ্বীপের যে দিকটা পর্বতময়, ইহাদের দল সেই দিকেই বাস করিত, বহুকাল ধরিয়া সংঘর্ষের ফলে সেদিকের লাভা প্রস্তরের বড় বড় খণ্ড মার্বেল পাথর মসৃণ ও চক্‌চকে হইয়া পড়িয়াছে—জলের ধারের, গুহামুখের এই সব মসৃণ প্রস্তরখণ্ড লুপ্তবংশ হতভাগ্য লোমশ শিল জাতির মূক স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বর্তমান থাকিয়া মানুষের হৃদয়হীনতা ও অর্থলোলুপতার লজ্জাজনক কাহিনী নীরবে প্রচার করিতেছে।

বর্তমানে গুয়াডেলুপ দ্বীপে এক জাতীয় অতিকায় শিল বাস করে। তাহাদিগকে দেখিতে অতি অদ্ভুত। খুব বড় বড়, গায়ের ত্বক্ খস্‌খসে ও পুরু, একটা করিয়া বড় শুঁড়ওয়ালা, অতি কদাকার জীব। এক সময়ে এই জাতীয় শিল দক্ষিণ মহাসাগরের দক্ষিণ জর্জিয়া প্রভৃতি দ্বীপে বাস করিত, কিন্তু যেদিন হইতে তিমি-শিকারীর দল জানিতে পারিল যে ইহাদের চর্বি হইতে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান তৈল পাওয়া যায়, সেই দিন হইতেই মেরুসাগরীয় দ্বীপসমূহে ইহাদের হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল এবং যখন দেখা গেল যে ইহাদের সংখ্যা এত কম হইয়া গিয়াছে যে শিকারের খরচা পোষায় না, তখনই মাত্র ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গুয়াডেলুপ দ্বীপের নিকটস্থ সান্ বেনিটো, সেড্রোস প্রভৃতি দ্বীপেও পূর্বে শিল ছিল কিন্তু মনুষ্যের অত্যাচারে তাহাদের বংশ লুপ্ত হইয়াছে। গুয়াডেলুপ দ্বীপের শিলের দল যে রক্ষা পাইয়াছে তাহা একটি দৈবঘটনা মাত্র।

উপরোক্ত বৈজ্ঞানিকদল দ্বীপের উত্তর ভাগের উপকূলে একদল অতিকায় শিলকে বালুসৈকতে শায়িতাবস্থায় দেখিতে পান, ইহারা এত অলস এবং নির্বোধ যে মানুষ দেখিলেও নড়ে না, পিট্‌পিট্ করিয়া কৌতূহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখে। বোধ হয় লোমশ শিলগুলিও এইরূপই ছিল এবং বিশেষ করিয়া সেইজন্যই এত শীঘ্র তাহাদিগকে ধরাধাম হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে—হিংস্র মানব এই নির্বোধ, অসহায় প্রাণীদের উপর এতটুকু কৃপাপ্রকাশ করে নাই। তাহাদের নিরীহ রক্তে শুভ্র সৈকতভূমি রঞ্জিত করিয়াছে, শুধু ধন-লালসায় ও আত্মোদর পূর্তির জন্য। ডাঃ এভারম্যান উপরোক্ত দলের অধিনায়ক ছিলেন, তাঁহারা একটি বড় শিলের দলের অত্যন্ত নিকটে গিয়া দলটির ফোটোগ্রাফ গ্রহণ করেন, বর্তমান প্রবন্ধের সেই ছবিটি দেখিলেই বোঝা যাইবে যে এই জীবগুলি এতই নির্বোধ যে এত অত্যাচার সত্ত্বেও মানুষ দেখিলে পলায়নের চিন্তা তাহাদের মোটা বুদ্ধিতে আদৌ আসে না। এমন কি তাঁহাদের দলের কেহ কেহ পায়ে পায়ে ইহাদের অত্যন্ত নিকটে গিয়া ইহাদের পিঠ চাপড়াইতে থাকেন, কেহ কেহ বা ঘোড়ার ন্যায় ইহাদের পিঠে চড়িয়া বসেন, ইহারা শুধু পিট্‌পিট্ করিয়া চাহিয়া থাকে মাত্র, নড়েও না চড়েও না। এরূপ নিরীহ প্রাণীকেও হত্যা করিতে হাত উঠে !....সে যাহা হউক্, ডাঃ এভারম্যান ও তাঁহার দল ফিরিয়া গিয়াই যাহাতে অতিকায় শিলগুলির অবাধ হত্যা বন্ধ হয় সেদিকে মেক্সিকো গবর্নমেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন, এবং সম্প্রতি মেক্সিকো গবর্নমেন্ট আইন জারি করিয়াছেন যে, তাঁহাদের বিনানুমতিতে এই সকল দ্বীপে অতিকায় শিল কেহ শিকার করিতে পারিবে না।

অতিকায় শিল ব্যতীত আরও নানাপ্রকার প্রাণী ইহারা গুয়াডেলুপ ও নিকটবর্তী সেড্রোস্ দ্বীপে দেখিতে পান। সেড্রোস্ দ্বীপ একেবারে মরুময়, ইহার অধিকাংশই কঠিন লাভা প্রস্তরের উচ্চাবচ ভূমি ও বৃক্ষলতাশূন্য কটা রং-এর বালুস্তূপ। এই দ্বীপের পশ্চিমাংশে লাভাক্ষেত্র যেখানে ঢালু হইয়া সমুদ্রে নামিয়া আসিয়াছে, সেই সমতল নিম্নভূমিতে এক সময় উদ্বিড়াল জাতীয় এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী (Sea Otter) বাস করিত। ইহারা পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সামুদ্রিক কাঁকড়া খুঁজিয়া খাইয়া বেড়াইতে ও সৈকতভূমিতে দলে দলে রৌদ্র পোহাইত। কিন্তু ইহাদের চর্মও বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়—ফলে ইহারাও প্রায় লোমশ শিলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছে ; বর্তমানে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা অতি সামান্য। সান ডিয়েগো প্রভৃতি দ্বীপ হইতে বিভিন্ন সময়ে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের উদ্বিড়ালের চর্ম ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে প্রেরিত হইয়াছে।

সেড্রোস্ দ্বীপের লাভাময় ভূমিতে একজাতীয় ফণিমনসা গাছ ছাড়া অন্য গাছ বড় একটা জন্মে না, তবে এক প্রকারের অদ্ভুত বৃক্ষ স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকে ডাঃ এভারম্যান নাম দিয়াছেন Elephant tree। এই বৃক্ষ দেখিতে অতি কদাকার, গুঁড়িটা খর্বকায়, অত্যন্ত স্থূল এবং দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন গাছটার সর্বাঙ্গে ফোড়া হইয়াছে। ইহার গুঁড়ির বেড় তিন হইতে পাঁচ ফুট, উচ্চতা প্রায়ই আট ফুটের বেশী হয় না, ছালের রং পীতাভ সাদা। অস্ত্র দ্বারা ছিদ্র করিলে গাছের গা হইতে ঘন দুগ্ধের মত এক প্রকার সাদা রস ঝরিতে থাকে। সেড্রোস্ দ্বীপে কূলবর্তী অগভীর জলে নানা প্রকারের মৎস্য, চিংড়ি ও কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়—তন্মধ্যে কয়েকটির রং অতি সুন্দর, বিশেষ করিয়া ইন্দ্রধনু রং-এর এক জাতীয় মাছ এত যে, ইউরোপ ও আমেরিকার মিউজিয়ামের জন্য নমুনা সংগ্রহ করিতে এখানে মাঝে মাঝে শিকারীর দল আসে। শীতকালে এখান হইতে এক প্রকার বৃহৎকায় চিংড়ি মাছ রাশি রাশি ধৃত হইয়া সান্ ফ্রান্‌সিস্‌কো রপ্তানী হইয়া থাকে।

সেড্রোস্ দ্বীপের পনেরো মাইল পশ্চিমে বেনিটো দ্বীপপুঞ্জে যথেষ্ট Sea-lion দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও শিলজাতীয় জন্তু, তবে ইহাদের চর্বি বা চর্ম এখনও পণ্যদ্রব্য মধ্যে স্থান না পাওয়াতে তিমি-শিকারীদের অত্যাচার এখনও ইহাদের উপর শুরু হয় নাই। তাহা ছাড়া ইহারা এত হুঁশিয়ার ও ভীরুস্বভাবের জন্তু যে, কোনোরূপ সন্দেহজনক শব্দ কানে যাইবামাত্র হুড়মুড় করিয়া দলসুদ্ধ গিয়া সমুদ্রের জলে পড়ে ও তৎক্ষণাৎ ডুব দিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

এই সমুদয় দ্বীপের কঙ্কর বালুকা ও লাভাপ্রস্তরময় ভূমিতে এক প্রকার অতিকায় ফণিমনসা জাতীয় (cactus) উদ্ভিদ জন্মে। সান্টা মার্গারিটা, নেটিভিডাড্ প্রভৃতি দ্বীপের অনেক স্থানে এই গাছের উচ্চতা ৬০ ফুটেরও বেশী। (অন্যত্র ছবি দ্রষ্টব্য)। শেষোক্ত দ্বীপে উত্তরাংশে এই বৃক্ষের অরণ্য আছে বলিলেও বেশী বলা হয় না। ডাঃ এভারম্যান লিখিয়াছেন, "জুলাই মাসের শেষ ভাগে যখন আমরা এই দ্বীপে যাই, তখন এই অতিকায় ফণিমনসা গাছের কণ্টকময় শীর্ষগুলি সুপক্ক ফলে ভরিয়া গিয়াছে এবং কাট্‌ঠোক্‌রা ও নানা বন্যপক্ষীদের দল মহাকলরবে ফলভোজনে মত্ত। আমরাও দু-একটি ফল মুখে দিয়া দেখিলাম সুপক্ক ফলগুলির আস্বাদ অতি সুমিষ্ট, ঘ্রাণ ও ভিতরের শাঁস অনেকটা র‍্যাস্পবেরি ফলের ন্যায়। খাইলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়—ফলগুলি বড় গাবের মত দেখিতে এবং অত বড়।"

[বিবিধ সংগ্রহ, বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬]

তারকার জন্ম

অনন্ত আকাশে লক্ষকোটী তারকা বিরাজমান। বর্তমানকালের জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ এই নক্ষত্রপুঞ্জের গতি, অবস্থান, পরস্পর হইতে পরস্পরের দূরত্ব, নব নব তারকার আবিষ্কার প্রভৃতি লইয়াই যে শুধু ব্যস্ত থাকেন তাহা নহে, কি কি উপাদানে এই সকল তারকা গঠিত, কোন্ কোন্ শ্রেণীর তারকা কি অবস্থায় আছে, তাহাদের বিবর্তনের ধারা কি প্রকার, এই সকল ব্যাপারের অনুসন্ধানেই আজকাল তাঁহার বেশী ব্যস্ত। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পুরাতন আমলের জ্যোতির্বিদ্যা, গতির মোড় ঘুরাইয়া সম্প্রতি এই নূতন পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাদারফোর্ড ও টম্‌সনের নব পদার্থ-তত্ত্ব ও আইনষ্টাইনের Relativity-তত্ত্ব এই অনুসন্ধানের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে ও অনেক অন্ধকারময় স্থানে নূতন আলোকপাত করিয়াছে। বর্তমানের স্পেক্টোস্কোপ বা বর্ণচ্ছত্রবিশ্লেষণযন্ত্র পুরাতন আমলের দূরবীক্ষণকে ক্রমশ হঠাইয়া দিতেছে।

এই সকল নব আবিষ্কারের ফলে এক অত্যন্ত পুরাতন বিদ্যা আবার নূতনভাবে দেখা দিয়াছে। আবহমানকাল হইতে মানুষের মনের চিরন্তনী পিপাসা—অনন্তকে সে জানিতে চায়, নিজে কোথা হইতে আসিল বুঝিতে চায়, বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে সকল তথ্য আয়ত্ত করিতে চায়। এই দৃশ্যমান নক্ষত্রজগৎ কি প্রকার, ইহার আকার ও আয়তন কিরূপ এসকল বিষয় লইয়া প্রাচীন যুগের টলেমি হইতে আধুনিক পণ্ডিতগণ পর্যন্ত সমানরূপ আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন। তবে বর্তমানের এই নক্ষত্রতত্ত্ব দৃশ্যমান তারকাজগৎকে বুঝিবার ও জানিবার যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে ও ইহাকে নূতনরূপে আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইতেছে।

নাক্ষত্রিক-বিশ্বের আয়তন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পূর্বাপেক্ষা অনেক বিস্তৃত হইয়াছে এবং যত বৎসর যাইতেছে এই ধারণা ক্রমশ বিস্তৃততর হইয়া পড়িতেছে। এখন মনে হইতেছে যে, এই বিস্তৃতি কতদিন ধরিয়া চলিবে ? প্রসিদ্ধ পণ্ডিত Jeans বলেন যে, ইহা চিরকাল চলিতে পারে না, শীঘ্রই আমরা ইহার সীমারেখাতে পৌঁছিয়া যাইব। আইনস্টাইনের Theory of Relativity অনুসারে মহাকাশ অসীম নহে—সীমাবদ্ধ, যদিও এমন কোনও স্থান নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে না এই বিস্তৃত স্থানের এমন কোনও স্থান, যেখান হইতে বলা যাইতে পারে বিশ্বের সীমা ঐখানে, ইহার পর আর বিশ্ব নাই। আমাদের পৃথিবী কোন নির্দিষ্টসংখ্যক স্থানযুক্ত বটে কিন্তু কেহ ইহার কোথাও দাঁড়ি টানিয়া বলিতে পারে না এইখানে পৃথিবী শেষ হইয়া গেল, মহাকাশের ব্যাপারও তদ্রুপ। ইহার বক্রতা জানায় ইহা সীমাবদ্ধ, যেমন পৃথিবীপৃষ্ঠের বক্রতা দ্বারা, এই অনুমান করা শিশুর পক্ষেও সহজ যে কোন না কোন স্থানে দুইমুখ এক হইবেই, মহাকাশের এই বক্রতা পণ্ডিতগণকে সেই সিদ্ধান্তেই লইয়া গিয়া ফেলিতেছে।

ঠিক করিয়া কোনো সংখ্যা বলা না গেলেও ডাঃ হাব্‌ল্ গণনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দূরবীক্ষণ দ্বারা আকাশের যে সর্বাপেক্ষা দূরের নীহারিকা দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবী হইতে তাহার যে দূরত্ব, মহাকাশের বিস্তৃতির সীমা তদপেক্ষা হাজার গুণের বেশী নহে। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সুদূরতম নীহারিকার

দূরত্বকে যদি মাপকাঠি ধরিয়া লওয়া যায় তবে একহাজার মাপকাঠি গুণিয়া শেষ হইবে যে বিন্দুতে, মহাকাশের আনুমানিক সীমা মোটামুটি সেই বিন্দু পর্যন্ত।

আলো ও বেতারবার্তার ঢেউ সমান বেগে ধাবিত হয়, কারণ উভয়েই আসলে একই বস্তু। সমগ্র পৃথিবীটা একবার ঘুরিয়া আসিতে এই উভয় বস্তুই এক সেকেন্ডের সাতভাগের একভাগ মাত্র সময় লইয়া থাকে এবং সমগ্র বিশ্বের চারিধার একবার ঘুরিয়া আসিতে সেই স্থানে লয় প্রায় একহাজার কোটি বৎসর। যদি পৃথিবীটাকে একটা পরমাণু কল্পনা করা যায় যাহার ব্যাস এক ইঞ্চির একটা কোটি ভাগের একভাগ মাত্র, তাহা হইলে সেই অনুপাতে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দূরবীক্ষণ যোগে যতদূর দৃষ্টি চলে তাহার পরিমাণ হইবে আমাদের এই পৃথিবীর মত, ও Theory of Relativity অনুসারে সারা নাক্ষত্রিক বিশ্বটার আয়তন হইবে একশত কোটি পৃথিবী একসঙ্গে তাল পাকাইয়া রাখিলে যত বড় হয় তত বড় ! এই সমুদয় আয়তন ও দূরত্বের বিপুলতার বিষয় ধারণা করিতে গেলে মানুষের কল্পনা স্তম্ভিত, হতভম্ব হইয়া পড়ে।

শুধু যে মহাকাশের আয়তনই এরূপ বিশাল তাহা নয়, যে বিপুল বস্তুসম্ভার ইহার নানাস্থানে ইতস্তত ছড়ানো আছে, তাহাদের পরিমাণের বিষয় চিন্তা করিতে গেলেও দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়। যে সূর্য আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা আয়তনে দশ লক্ষ গুণ বড় ও তিন লক্ষ গুণ বস্তুভারসমৃদ্ধ, তাহা এই বিপুল মহাকাশ জলধিবেলার এক ক্ষুদ্র বালুকণা মাত্র। এই সূর্য যে শ্রেণীর তারকা, অনন্ত আকাশে সে শ্রেণীর তারকা যে কত কোটি আছে তাহার স্থিরতা নাই। ডাঃ সিয়ার্সের গণনানুসারে এই শ্রেণীতে অন্তত তিনশত কোটি তারকা আছে। কিন্তু এই বিশেষ শ্রেণী ছাড়া আকাশে আরও নানা শ্রেণীর তারকা বর্তমান এবং তাহা ছাড়া প্রত্যেকটি নীহারিকা ও ছায়াপথের সীমার বহির্ভূত অন্যান্য Spiral Nebula সমূহও রাশি রাশি তারকাপুঞ্জের সম্মিলন মাত্র। কোনো কোনো স্থানে এই সকল তারকা এখনও বিবর্তনের নিম্ন ধাপে অবস্থিত, কোন সুদূর ভবিষ্যতে তাহারাও তারকা হইয়া উঠিবে। কুম্ভকারের চক্রে মৃৎপিণ্ডের মত তাহাদের স্থান এখনও বিশ্বগঠনের সর্বনিম্ন কোঠায়। পণ্ডিতেরা এই সকল নীহারিকার প্রত্যেকটির মধ্যে কতটা বস্তু আছে তাহা গণনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এক একটি নীহারিকার দ্বারা আমাদের সূর্যের ন্যায় একশত কোটি সূর্যের গঠন সম্ভবপর হইতে পারে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে এই নীহারিকাগুলি কত বড়। এই প্রবন্ধের ফোটোগ্রাফগুলির আয়তন বাড়াইয়া যদি এশিয়া মহাদেশের সমান করা যায় তবে পৃথিবীর মত আয়তনবিশিষ্ট কোনো বস্তু উহাদের পৃষ্ঠে পরিদৃশ্যমান হইবে খালি চোখে নয়, অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রযোগে !

ডাঃ হাব্‌ল্‌, মাউন্ট উইলসান্‌ আবজারভেটারীর ১০০-ইঞ্চি দূরবীক্ষণ সাহায্যে এরূপ আয়তনের প্রায় বিশ লক্ষ নীহারিকা বাহির করিয়াছেন যদিও সমগ্র বিশ্বের একহাজার কোটি ভাগের একভাগ মাত্র এই দূরবীক্ষণ সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। একহাজার কোটিকে যদি বিশলক্ষ দ্বারা গুণ করা যায় এবং ঐ গুণফলকে যদি পুনরায় একহাজার কোটি দ্বারা গুণ করা যায় তবে যে গুণফল দাঁড়াইবে, আমাদের এই দৃশ্যমান নক্ষত্রজগতের নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ততগুলি। অতগুলি বালুকণা যদি বাংলাদেশের উপর ছড়াইয়া দেওয়া যায় তবে সমগ্র বঙ্গভূমি শত শত ফুট উচ্চ বালুকাস্তূপের মধ্যে প্রোথিত হইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে এই অনুপাতে আমাদের পৃথিবীর আয়তন উক্ত বালুকার স্তূপের এককণা বালুকার দশলক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র।

নীহারিকা হইতেই যে তারকাদল উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। সাধারণত Spiral আকৃতির নীহারিকা হইতেই এ ঘটনা সম্ভবপর হয়। এই সকল নীহারিকা নানা আকৃতির হইয়া থাকে। তবে সাধারণত ইহারা সকলেই অতি বিশাল বাষ্পপিণ্ড এবং প্রত্যেকেই নানারূপ বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে, এবং এই ঘূর্ণনবেগের বিভিন্নতা হেতু ইহাদের আকৃতিও বিভিন্ন প্রকারের। যে বাষ্পপিণ্ডের ঘূর্ণন নাই, তাহার আকৃতি হইবে গোল কিন্তু ঘুরিতে আরম্ভ করিলেই তাহার আকৃতি ক্রমশ চেপ্টা হইতে থাকিবে এবং পরিশেষে খুব পাতলা একখানা থালার মত আকৃতি ধারণ করিবে। এইবার এই পাতলা থালাখানি ভাঙ্গিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্পপিণ্ডে পরিণত হইবে, এই প্রত্যেক বাষ্পপিণ্ড এক একটি শিশু তারকা। ৪ নং ছবির নীহারিকাটি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে ইহার মধ্যে ও চারিপাশে এরূপ তারকা বিন্দুর সৃষ্টি শুরু হইয়াছে। ৫ নং ছবিতে এই ব্যাপারের শেষ পরিণতি দেখানো হইতেছে। এই ছবিতে দেখা যাইবে যে, নীহারিকাটি অনেক কাল পূর্বে ভাঙ্গিয়া গিয়া লক্ষ লক্ষ তারকায় পরিণত হইয়াছে, সুতরাং এই ফোটোগ্রাফে (The Greater Magellanic cloud) শুধুই তারকা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে Sir J. H. Jeans বলেন, "Our galactic system of stars is probably the final product of just such a transformation, the Milky Way still recording the position of the equitorial plane of the original nebula." অর্থাৎ—আমরা যে নক্ষত্রজগতের অন্তর্ভুক্ত, তাহাও অতীতযুগের এক নীহারিকা হইতে ঠিক এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন হইয়াছে ও বর্তমানে ছায়াপথ সেই আদিম নীহারিকার ক্রান্তিবৃত্তের অবস্থিতি স্থান নির্দেশ করিতেছে।

পণ্ডিতেরা আন্দাজ করেন প্রায় আট লক্ষ কোটি বৎসর পূর্বে মহাকাশের এই অঞ্চলে এক ঘূর্ণায়মান নীহারিকা ভাঙ্গিয়া গিয়া আমাদের সূর্য ও চারিপাশের তারকারাজির সৃষ্টি করিয়াছে।

অবশ্য উপরে মাত্র এক শ্রেণীর তারকার কথা বলা হইল। আরও নানাবিধ শ্রেণী আছে এবং শ্রেণীভেদে তাহাদের বয়সেরও তারতম্য আছে। তারকার বয়স বলা গেলেও, যে বস্তুতে তারকার জন্ম তাহা নীহারিকা অবস্থাতে কতকাল কাটাইয়াছে তাহা আদৌ বলা যায় না। বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভ কোন সময় হইতে, ব্রহ্মার সৃজন দিবসের সে ঊষা কতকাল আগে মহাকাল সমুদ্রে মিলাইয়া গিয়াছে, বিজ্ঞান সে বিষয়ে কোনো আলোকপাত করিতে পারে না। একথাও বলা যায় যে এই সৃষ্টিটা হঠাৎ একসময়ে একদিন ঘটিয়াছিল বা ধীরে ধীরে সুনির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী অগ্রসর হইয়া বর্তমানে দৃষ্টির গোচর ও অগোচর এই বিশাল বিশ্বে পরিণত হইয়াছে।
[বিবিধ সংগ্রহ, বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৬]

উল্কার সমাধি

অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের দিকে চোখ রাখিলে উল্কাপাত দেখিতে পাওয়া যায় না এমন রাত্রি খুব কমই আসে। মহাশূন্যের এই সকল রহস্যময় বস্তুপিণ্ড দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের আদৌ ঘটিয়া উঠিত না, যদি না তাহারা পৃথিবীর আকর্ষণের শক্তির মধ্যে আসিয়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িত। আমাদের বায়ুমণ্ডলের সংঘর্ষণে যেমন ইহারা জ্বলিয়া উঠে, অমনি আমাদের চোখে পড়ে। দিনমানেও অগণিত উল্কা নানাদিকে পড়িতেছে কিন্তু সূর্যের আলোকে ইহাদের অগ্নিপুষ্প অদৃশ্য থাকিয়া যায়, যদিও খুব বড় উল্কা হইলে কখনো কখনো দেখা গিয়া থাকে।

উল্কাপিণ্ডের অধিকাংশই বায়ুমণ্ডলের পর্দার মধ্য দিয়া আসিবার সময় পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, পৃথিবীতে যাহা পড়ে তাহা প্রায়ই বৃহত্তর পিণ্ডটার একটা ভস্মাবশিষ্ট ছোট টুকরা মাত্র। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উল্কাপিণ্ডের বেশীর ভাগই লৌহ, অনেক স্থলে নিকেল মিশ্রিত লৌহ। পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাপ্ত মূল পদার্থগুলির সাতাশটি উল্কাপিণ্ডে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীতে নাই, এমন কোন মূল পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়াতে একটা উল্কাপিণ্ড পড়িয়াছিল, উহাতে কৃষ্ণবর্ণ হীরকের সমশ্রেণীভুক্ত কার্বনক্রিস্ট্যাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

আমেরিকার অন্তর্গত আরিজোনার মরুপ্রদেশে একটি বৃহৎ উল্কাপিণ্ডের সমাধি-গহ্বর সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরিজোনার যে মরুভূমিতে এই উল্কাকুণ্ড বিদ্যমান তাহার দৃশ্যও অতি অদ্ভুত। এই মরুর অধিকাংশই প্রস্তরময় এবং ঐ সকল প্রস্তর আবার ঘন বেগুনী বা লাল রং-এর, এইজন্য ইংরাজিতে এই অংশকে Painted Desert বা রং চং-করা মরুভূমি বলে। কাপ্তেন স্টিভেন্‌স্‌ ও লেফ্‌ট্যানান্ট ম্যাক্রেডি নামক যুক্তরাজ্যের বিমান বিভাগের দুইজন কর্মচারী সম্প্রতি বিমানপোতে করিয়া এই স্থান পরিদর্শনে গিয়াছিলেন—তাঁহারা বলেন যে আকাশ হইতে দেখিলে উল্কাকুণ্ডটি ঠিক দেখায় যেন কোন বৃহৎ কামানের গোলা মাটিতে পড়িয়া পড়িয়া গহ্বরটির সৃষ্টি করিয়াছে। উপর হইতে গহ্বরটির দৃশ্য হইয়াছিল অত্যন্ত অদ্ভুত, চারিপাশের বেগুনী ও লাল রংয়ের বালুকাপ্রস্তরের মধ্যে উল্কাকুণ্ডের প্রান্তস্থ শ্বেতবর্ণ চূর্ণপ্রস্তরের বর্ণবৈপরীত্য দৃষ্টিকে বড় মুগ্ধ করে। এইস্থান অতি দুর্গম মরুভূমির মধ্যে বলিয়া ভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত লোকজনদের ভিড় এখানে খুব কম। নিকটতম স্টেশন, উইন্‌স্লো এখান হইতে কুড়ি মাইল দূরে, তাহা ছাড়া মরুভূমির এই অংশে জল পাওয়া যায় না বলিয়া নিছক আমোদ যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহাদের দল এখানে বড় একটা ঘেঁষিতে পারে না।

উল্কাকুণ্ডটি প্রায় ৫৭০ ফুট গভীর। বিশাল উল্কাপিণ্ডটা যে সময়ে এখানে পড়িয়াছিল, তখন তাহার সংঘর্ষণে মাটির উপরকারের ও অভ্যন্তরের অনেক ছোট বড় প্রস্তর চূর্ণীকৃত হইয়া কুণ্ডের ধারে ধারে নানা আকারের স্তূপের সৃষ্টি করিয়াছে। কোনও কোনও স্থলে এই স্তূপের উচ্চতা ১৫০ ফুট, কোনও স্থানে আরও কম। বাহিরদিকের ঢালু ধার বাহিয়া উঠিয়া কুণ্ডটির প্রান্তে দাঁড়াইলে ও গভীর গর্তের দিকে চাহিয়া সমস্ত ব্যাপারটি ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। ব্যোমপথগামী কোন ক্রুদ্ধ দৈত্য যেন বিশাল প্রস্তরখণ্ডটাকে কোন্‌কালে ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল পৃথিবীর বুকে, কোন্‌ খেয়ালে কেহ জানে না, নির্জন মরুভূমির মধ্যে তার ক্ষতচিহ্ন এখনও সেইরূপই স্পষ্ট, সেইরূপই গভীর, কতকাল কাটিয়া গিয়াছে সে দাগ তবুও মিলাইয়া যায় নাই। কুণ্ডের ভিতর দিকের ঢালু ভারী উঁচুনীচু, স্থানে স্থানে খাড়াই খুব বেশী, তাহা ছাড়া বড় বড় পাথরের স্তূপ এখানে ওখানে এমনভাবে অবস্থিত যে কুণ্ডটার তলদেশে নামা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। পৃথিবীর অন্য কোথাও এত বড় উল্কাকুণ্ড আবিষ্কৃত হয় নাই। এ পর্যন্ত

এমন কোনো উল্কা দেখিতে পাওয়া যায় নাই, যাহা পৃথিবীপৃষ্ঠে এগারো ফুটের বেশী গর্ত করিয়াছে। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জুলাই শেষরাত্রিতে উত্তর সাইবেরিয়ার একস্থানের অধিবাসীগণ একটি সুবৃহৎ অগ্নিপিণ্ডকে আকাশপথে ধাবিত হইতে দেখে এবং অল্পক্ষণ পরেই বজ্রধ্বনির মত আওয়াজ শুনিতে পায়। দুই বৎসর হইল জনৈক রুশীয় বৈজ্ঞানিক উত্তর সাইবেরিয়ার এনিসিস্ক জেলায় গভীর পাইন অরণ্যের স্থানে এই উল্কাপিণ্ডের পতনস্থান খুঁজিয়া পাইয়াছেন। চারিধারের ত্রিশ মাইল ব্যাপী স্থানের মধ্যে কোথাও একটি গাছও মাটির উপর দাঁড়াইয়া নাই, যেন ভীষণ ঝড়ের বেগে সব একেবারে শিকড়সুদ্ধ উপড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। এই স্থানে অরণ্যের মধ্যে নানা ছোট বড় উল্কার গহ্বর তিনি দেখিতে পান, কিন্তু ইহার কোনোটিই আরিজোনা মরুভূমির এই উল্কাকুণ্ডের মত বিশাল আয়তনের নহে।

কুণ্ডটির বিশালতা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে হইলে ইহার চারিদিকে একবার ভ্রমণ করা আবশ্যক। বেড়ের পরিধি পুরা তিন মাইল। কুণ্ডের ব্যাস ৪২০০ ফুট, এক মাইলের ৪/৫ ভাগ। চারিদিকের মাটি ও পাথর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ইহা সহজেই বোঝা যায় যে কোনো বৃহৎ বস্তু পড়িবার ভারে নিকটবর্তী সমুদয় বস্তু চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কুণ্ডের বাহিরের দিকে ঢালু শুধু এই চূর্ণীকৃত চুনা পাথর ও বেলে পাথরের স্তূপ ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই বেলে পাথর ভূমিপৃষ্ঠ হইতে তিনশত ফুট নিম্নে একস্থানে ছিল, উল্কাপতনের ভীমসংঘাতে অত নিম্নস্তরের প্রস্তররাশিকেও চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া উড়াইয়া চতুর্দিকের প্রায় ছয় মাইল স্থানের সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছে। চূর্ণ প্রস্তর বাদে অনেক বড় বড় প্রস্তরখণ্ডও ভিতর ও বাহিরের ঢালুর নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে (১নং ছবি দ্রষ্টব্য)। সর্বাপেক্ষা বড় খণ্ডটির ওজন প্রায় ৭০০০ হাজার টন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই উল্কাটি পতনের সংঘাতে প্রায় কুড়ি কোটি টন বালু ও প্রস্তরকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। সমগ্র পানামা খালটি খনন করিতে যতটা মাটি ও পাথর কাটিতে হইয়াছিল, এক মুহূর্তের মধ্যে এই উল্কাপ্রবর তাহার এক-চতুর্থাংশ মাটি ও পাথর মরুভূমির এই অংশ হইতে খুঁড়িয়া ফেলিয়াছে ! কল্পনা করা যাক এই বৃহৎ ব্যাপার কিরূপে ঘটিয়াছিল। লৌহ ও নিকেলের একটা বিশাল পিণ্ড (খুব সম্ভবত সেটা কোনো নির্বাপিত ধূমকেতুর একটা টুক্‌রা মাত্র) সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাভাস পথে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ কিরূপে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়ে ও তৎক্ষণাৎ নিজ কক্ষচ্যুত হইয়া ভীমবেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সেকেণ্ডে ২৫ হইতে ৩০ মাইল বেগে ঢুকিয়া পড়িতেই ভীষণ সংঘর্ষণের ফলে জ্বলিয়া উঠে। পৃথিবীর বায়ুস্তর প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছিল এই আগন্তুক দৈত্যের গতিরোধ করিবার জন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। পিণ্ডটিও তো নিতান্ত এতটুকু নয়, কমবেশী তিনশত হইতে পাঁচশত ফুট ব্যাসবিশিষ্ট, ওজনেও অন্তত দশ লক্ষ টন।

হঠাৎ একটা তীব্র আলোকে চারিধার আলোকিত হইয়া উঠিল, ভীষণ ভূমিকম্পে যেন সমগ্র মরুভূমিটা ও চারিধারের পাহাড়গুলা যেন দুলিয়া উঠিল, ধূলা বালি ও পাথরের গুঁড়ায় আকাশ অন্ধকার হইয়া গেল, কিসের একটা ভয়ানক ঝাপটা অনুভূত হইল, তাহার পর কিছুক্ষণ কোনো দিকে কিছু দেখা গেল না। অনেকক্ষণ পরে যখন আকাশ পুনরায় পরিষ্কার হইল, তখন তৃণহীন মরুভূমির প্রস্তরময় ধূসর বক্ষে একটা গোলাকার ক্ষতচিহ্ন ছাড়া আর কোথাও কিছু নাই—লৌহ ও নিকেল পিণ্ড শত শত ফুট মাটির তলায় প্রোথিত হইয়া গিয়াছে !

এই মৃত্তিকাপ্রোথিত উল্কাপিণ্ড কোথায় কত নিম্নে আছে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য এ পর্যন্ত বহু অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। উল্কাকুণ্ডটির ঠিক মধ্যস্থলে ড্রিলযন্ত্র দ্বারা একটি গভীর কূপ খনন করা হয় কিন্তু চোরাবালির জন্য এই কার্য সেখানে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অন্য অন্য স্থানেও খনন করিয়া দেখা হইয়াছে কিন্তু লৌহ মিশ্রিত বালি ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর সন্ধান মিলে নাই। ১৯২২ সালে খননকারীগণের ড্রিলযন্ত্র কিসে আটকাইয়া যায় এবং বহু চেষ্টাতেও তাহা আর নামানো যায় নাই। কিন্তু পিণ্ডটি যে ঠিক কোথায় আছে, তাহা এ পর্যন্ত কেহ বলিতে পারে নাই। তবে এটুকু বোঝা যায় যে উল্কাপিণ্ডটি উত্তর দিক হইতে আসিয়া বাঁকাভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে ধাক্কা দেয় এবং উপরিস্থ চুনাপাথর ও বেলেপাথর চূর্ণবিচূর্ণ করিতে করিতে ভিতরে ঢুকিয়া যায় ও কুণ্ডের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের নিম্নে কোনো স্থানে কঠিনতর বেলেপাথরের স্তরে পৌঁছিয়া আটকাইয়া থামিয়া পড়ে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে কুণ্ডের উত্তরদিকের দেওয়াল খনন করিবার সময়ও খননকারীগণ কয়েকটি লৌহপিণ্ড প্রাপ্ত হয়, ইহাদের উপরটা অন্যান্য উল্কাপিণ্ডের ন্যায় ঝলসানো ও গর্তবিশিষ্ট । ইহাতে মনে হয় যে বড় পিণ্ডটার পিছু পিছু আরও ছোটখাটো অনেক লৌহ ও নিকেলের টুকরা আসে এবং কতক কুণ্ডের দেওয়ালে প্রোথিত হইয়া আছে, কতক বা চতুর্দিকের মরুভূমিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খুঁজিলে কুণ্ডের চারিধারে বহুদূর পর্যন্ত এই সকল টুক্‌রো প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কোনো কোনোটিতে অতি ক্ষুদ্র হীরার কণা সংলগ্ন থাকে। অত্যন্ত উত্তাপে উল্কাপিণ্ডস্থিত কার্বন দানা বাঁধিয়া ঐ সকল হীরককণায় পরিণত হইয়াছে। এক হাজার ফুট নীচের বালু সবই লৌহমিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায় এবং ১২০০ ফুট নীচে গিয়া শুধু লৌহচূর্ণ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

১৩৭৬ ফুট নিম্নে খুঁড়িয়া যাহা বাহির হইয়া আসিতে লাগিল তাহাতে শতকরা ষাটভাগ

নিকেলমিশ্রিত লৌহচূর্ণ। আরও কিছুদূরে গিয়া ড্রিল কোনো কঠিন বস্তুতে বাধা পাইয়া আটকাইয়া গেল, নানা চেষ্টাতেও আর কিছুতেই তাহাকে নামানো গেল না। বাধ্য হইয়া খনন-কার্য বন্ধ রাখিতে হইল। অনেকে মনে করেন যে ঐখানেই সেই বিশাল লৌহ ও নিকেল পিণ্ডটি প্রোথিত আছে ।

উল্কাকুণ্ডের চারিধার পরীক্ষা না করিলে কি ভয়ানক বেগে যে এই বিশাল পিণ্ডটি পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইয়াছিল তাহা বুঝা যাইবে না। চক্ষে না দেখিলে ইহা বুঝানো শক্ত। সংঘর্ষের ফলে লাল বেলেপাথর ও সাদা চুনাপাথর এরূপ গুঁড়া হইয়া গিয়াছে যে এরূপ একমুঠা গুঁড়া অত্যন্ত সরু চালুনির মধ্য দিয়া গলিয়া যাইতে পারে। স্থানীয় ইণ্ডিয়ান অধিবাসীদের নিকট এই প্রস্তরচূর্ণ অত্যন্ত পবিত্র জিনিস, তাহাদের বিশেষ বিশেষ পালাপার্বণে বালক-বালিকারা আসিয়া এই শ্বেতচূর্ণ কুড়াইয়া লইয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন কুণ্ডটি অন্তত পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন। পাঁচ হাজার বৎসর পুর্বে কোনো একদিন সেই বিশাল লৌহপিণ্ডটি এই নির্জন মরুবক্ষে প্রোথিত হইয়া যায়, কতকাল কাটিয়া গিয়াছে, এতদিন পরে লোকে তাহার সন্ধান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

আরিজোনা মরুভূমির এই উল্কাকুণ্ডটির প্রকৃতি চন্দ্রমণ্ডলস্থ গহ্বরগুলির অনুরূপ। চন্দ্রের যে অংশ সর্বদা পৃথিবীর দিকে ফিরানো থাকে, তাহাতে এ পর্যন্ত ত্রিশ হাজার গহ্বর গণনা করা গিয়াছে। তবে চন্দ্রমণ্ডলের অনেক গহ্বর এই উল্কাকুণ্ডটির অপেক্ষা অনেক বড়। আকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে চন্দ্রমণ্ডলের গহ্বরগুলিও উল্কাপতনের ফলে সৃষ্ট।

[বিবিধ সংগ্রহ, বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৬]

ব্রিটানির প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর-কীর্তি

ফ্রান্সের অন্তর্গত ব্রিটানি প্রদেশে আদিম কালের মানুষের হাতের যে বিরাট প্রস্তরকীর্তিসমূহ জনহীন প্রান্তরের বুকে নির্বাক রহস্যের মত কত যুগ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার ইতিহাস এ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গেল। দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে জাতির কর্মশক্তির নিদর্শন, তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না। সে যুগের উপযোগী মাপ-কাঠিতে বিচার করিতে গেলে বরং তাহারা সভ্যতার উচ্চ ধাপে আরোহণ করিয়াছিল। এই জাতির শিক্ষা ও সভ্যতা যেরূপই থাকুক, ইহারা চেষ্টা পাইয়াছিল যাহাতে ভবিষ্যৎ যুগের মানুষেরা তাহাদের কথা একেবারে ভুলিয়া না যায়। অন্য কোনো আত্মপ্রকাশের কৌশল হয়তো তখন অনাবিষ্কৃত ছিল, তাই তাহারা বিশাল প্রান্তরের সারা জায়গা জুড়িয়া এই সকল বিশাল পাষাণখণ্ডগুলি একটি বিশেষ ভাবে সাজাইয়া কি যেন বলিবার চেষ্টা পাইয়াছে, কিন্তু এত চেষ্টা এত অধ্যবসায় সত্ত্বেও তাহা অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। কে তাহারা বা কি বলিবার চেষ্টা পাইয়াছে, এরূপ ভাবে পাষাণখণ্ডের পর পাষাণখণ্ড বহিয়া আনিয়া, তাহা আজ কে বলিবে !

মেসোপটেমিয়ার মরুভূমিতে মরু-বালু-প্রোথিত আসিরিয়া সভ্যতার সকল খুঁটিনাটি খবরই আজ পাওয়া যাইতেছে কারণ তাহার চাবিকাঠিটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মরুভূমির বালুস্তূপের মধ্য হইতে বাহির করিয়া মরিচা ঝাড়িয়া পুঁছিয়া ব্যবহারে লাগাইতেছেন। আসিরিয়ার তীর-ফলাকার বর্ণমালার পাঠোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে আসিরিয়ার সভ্যতার ইতিহাস আর কুহেলিঘেরা রহস্য নয়, তাহা এখন প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু পাঠানুরাগী ব্যক্তিরই সম্পত্তি। ব্রিটানির এই অজ্ঞাত সভ্যতার যেরপ কোনো চাবিকাঠি না পাওয়া গেলেও কয়েকজন উৎসাহী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ইহারই মধ্যে এগুলি সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বলা আবশ্যক যে এই তথ্যের অনেক অংশই কল্পনা ও অনুমান বটে, তবুও ইহাদের সাহায্যে আমরা dolmen-গুলির সম্বন্ধে একটা আনুমানিক কাহিনীও খাড়া করিতে পারি। মিঃ জে. মিল্‌ন্ এই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের অন্যতম। প্রধানতঃ ইঁহার ও ইঁহার সহযোগীগণের পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের ফলে ব্যাপার অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

পশ্চিম ফ্রান্সের নানাস্থানে এ ধরনের dolmen থাকিলেও, ব্রিটানি প্রদেশের কার্ণাক নামক স্থানে এগুলি সংখ্যায় অনেক বেশী আছে, প্রায় তিন শতেরও উপর হইবে। মিঃ মিল্‌নের দ্বারা নানাস্থান হইতে সংগৃহীত প্রস্তরায়ুধ, মৃৎপাত্র ও অলঙ্কার এখন কার্ণাকের মিউজিয়ামে আছে। এরই নাম অনুসারে মিউজিয়ামের নামকরণ হইয়াছে।

মিঃ মিল্‌নের অনুসন্ধানের ফলে ইহা বেশ সুস্পষ্ট অনুমিত হয় যে, এই স্থানটিতে উক্ত জাতীয় বীরপুরুষ, রাজা ও নেতাগণ সমাধিস্থ হইতেন এবং পরবর্তী যুগে সেই জাতিরই লোক এইখানে নানা উৎসব অনুষ্ঠানে আসিয়া যোগ

দিত—কালে বোধ হয় এই স্থানটি তাহাদের একটা তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের স্‌লস্‌বেরি প্রান্তরের Stonehenge গুলি যেমন ব্রিটিশ দ্বীপসমূহের প্রাচীন কেন্টিক জাতির সমাধিস্থান ও তীর্থস্থান ছিল—বা তাহা যাহাই থাকুক, কার্ণাকের এই প্রান্তরও ফ্রান্স ও পশ্চিম ইউরোপের অবিকল সেইরূপ তীর্থস্থান ছিল। এই প্রাচীন জাতির প্রস্তরকীর্তি সকল এশিয়া হইতে শুরু করিয়া উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও শেষ নরওয়ে সুইডেন পর্যন্ত সকল স্থানে নানারূপে বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রকারের প্রকাশভঙ্গীর মধ্য দিয়া পরিব্যাপ্ত। ইহা হইতে অনুমান করা অন্যায় নয় যে, মধ্য এশিয়া হইতে ভ্রমণ শুরু করিয়া এই জাতি বা তাহাদের শিক্ষা ও সভ্যতা ক্রমশ আফ্রিকা, তথা হইতে ভূমধ্যসাগর উত্তীর্ণ হইয়া স্পেন ও আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল ভাগ বহিয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ও তথা হইতে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দিকে প্রয়াণ করিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, এই প্রকারে বিস্তৃত হইতে এই সভ্যতার সময় লাগিয়াছিল অন্তত দুই হাজার বৎসর। পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি যে, সমাধিগহ্বরে প্রাপ্ত অস্ত্র ও অলঙ্কারগুলি ক্রমশ উন্নততর হইতেছে। পুর্বের অস্ত্রগুলি অপেক্ষা পরেরগুলি বেশী পালিশ করা, বেশী মসৃণ, সকল রকমেই উন্নততর শিল্প ও সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচায়ক। কার্ণাকের কতকগুলি dolmenএর গায়ে সে যুগের দেবদেবী বা বীরপুরুষের মূর্তি খোদাই করার যে চেষ্টা হইয়াছে, সেগুলি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া মিল্‌নে্‌ ও তাঁহার সহযোগী জাকারি ল্য রুজিক্‌ অনুমান করেন যে, যে-সময়ে এই dolmenগুলি কার্ণাকের প্রান্তরে স্থাপিত হইয়াছিল তখন লৌহ অথবা অন্য কোনো প্রকারের ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ইঁহারা অনুমান করেন যে, খোদাইগুলির অধিকাংশ কৃষিকর্মের নানা অবস্থার প্রতিরূপ। বলীবর্দ, লাঙ্গল, সূর্যালোকপুষ্ট শস্যের শীষ প্রভৃতি নানারূপ খোদাই দেখিয়া মনে হয় এই জাতি প্রধানত কৃষিজীবী ছিল এবং কৃষিকর্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত।

কিন্তু এই জাতি ধাতুর ব্যবহারে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, যদিও ইহার কারণ নির্ণয় করা সহজ নহে। কালে গল জাতির পরাক্রম ও তাহাদের ব্রোঞ্জধাতু নির্মিত তরবারি ও বর্শাফলকের বিরুদ্ধে ইহারা দাঁড়াইতে পারে নাই ; দেশ তাহাদিগকেই ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। আবার যখন রোমানগণ গলজাতির দেশ আক্রমণ করিল, তখন ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্রকে রোমানদিগের ইস্পাতের যুদ্ধাস্ত্রের নিকট হার মানিতে হইয়াছিল। কিন্তু কোনো নব্য সভ্যতাই দেশের পুরাতন রীতিনীতি সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসকে একেবারে হটাইয়া দিতে পারে না, কোনো না কোনো প্রচ্ছন্নরূপে, দেশকালোপযোগী পরিবর্তিতভাবে তাহা সমাজের কোনো না কোনো স্তরে থাকিয়াই যায়। সব দেশেই এরূপ হইয়াছে, ফ্রান্সেও হইয়াছিল। প্রস্তর পুজার অভ্যাস বহুকাল পর্যন্ত লোকে ভুলে নাই, এবং প্রথম খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পরও বহুদিন পর্যন্ত ইহা নানাভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ছিল। ইহাকে বন্ধ করিবার জন্য খ্রীষ্ট যাজক সম্প্রদায়কে অনুশাসনের পর অনুশাসন জারি করিতে হইয়াছে। এমন কি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেও যে ইহা ছিল তাহা সে সময়ের জনৈক জেসুইট প্রচারকের গ্রন্থ হইতে আমরা বুঝিতে পারি এবং ব্রিটানির কৃষক ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রস্তরপুজা যে বর্তমান সময় পর্যন্তও প্রচলিত আছে, তাহা তাহাদের কতিপয় গ্রাম্য উৎসবের অনুষ্ঠান হইতে বেশ বোঝ যায়।

কার্ণাকের এই প্রাচীন প্রস্তরকীর্তিগুলি নয় প্রকারের, তন্মধ্যে এই কয়টি প্রধান। (১) Menhir—এগুলি বড় বড় পাথর খাড়া করিয়া পোঁতা (২) Dolmen—এগুলি ঘরের আকার, ছাদে ও দেওয়ালের স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অমসৃণ ও পালিশবিহীন পাথর। (৩) Tumulus—প্রস্তরস্তূপ। (৪) Cromlech-অনেকগুলি খাড়া হিসাবে পোঁতা পাথর বৃত্তাকার বা অর্ধবৃত্তাকার অবস্থায় সাজানো। ইহা ছাড়া আর এক ধরনের ব্যাপার আছে—অনেকগুলি menhir বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে সমান্তরাল ভাবে পোঁতা—দেখিতে যেন লড়াইয়ে সিপাহীর সারির মত।

এইগুলির আকৃতি, দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা অতি বিস্ময়কর। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় menhir-টি বর্তমান ভূমিকম্পে উপড়াইয়া ফেলিয়াছে—তাহার উচ্চতা ৭০ ফুট এবং ওজন দশ হাজার মণেরও উপর। Dolmenগুলির উচ্চতা ১৮ হইতে ২০ ফুট ; ছাদের প্রস্তরগুলি অনেক স্থানে ৩/4 ফুট পুরু। কার্ণাকের প্রস্তরের menhir-এর যে সারি আছে তাহা ৫ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। সেন্ট মাইকেলের নিকটবর্তী একটি প্রস্তরস্তূপকে দেখিলে মনুষ্যহস্তগঠিত বলিয়া মনে হয় না—পাহাড় বলিয়া মনে হয়। না জানিলে হঠাৎ ইহা বিশ্বাস করা কঠিন যে ইহা মানুষের হাতে তৈয়ারী। পুরাকালে dolmenগুলির চতুস্পার্শ্বে এইরূপ ধরণের, তবে ইহার অপেক্ষা ক্ষুদ্র আকৃতির, প্রস্তর মৃত্তিকাস্তূপ ছিল। কালক্রমে তাহা লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্তূপগুলি অধিকাংশস্থলেই সমাধি—এগুলি খননকালে বহু প্রস্তরায়ুধ ও নরকঙ্কালের টুকরা প্রাপ্ত হওয়া গিয়েছে। ছোট dolmenগুলিতেও অনেক স্থানে প্রস্তরের আধারের মধ্যে কোনো প্রকার জন্তুর হাড়, মানুষের হাড় প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। শেষেরগুলি মনে হয় সমাধিস্থ রাজা বা বীরপুরুষের ভৃত্য ও অনুচরগণের অস্থি-প্রাচীনযুগের রীতি অনুসারে ইহাদিগকে প্রভুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করিয়া পরজগতে তাঁহার সেবাকার্যে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ছাড়া নানাপ্রকারের প্রস্তরনির্মিত বর্শাফলক, তীরের অগ্রভাগ, কুঠার, মৃন্ময় পাত্র, পাথরের হার ও আংটি প্রভৃতিও পাওয়া গিয়াছে। Menhir-গুলি

যেখানে সারবন্দী ও সমান্তরালভাবে বসানো আছে সে স্থানটি বোধ হয় দেবপুজার স্থান ছিল। দুই সারির মাঝের পথটি দিয়া সম্ভবত পুরোহিত ও পুজার্থীগণ যাতায়াত করিত। এইরূপ সারবন্দী menhir-গুলির পশ্চিম প্রান্তে প্রায় সকল স্থানেই একটি করিয়া cromlech অর্থাৎ বৃত্তাকার বা অর্ধবৃত্তাকার প্রস্তর সংস্থান আছে ; সেখানে বোধহয় পুজার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি নিষ্পন্ন হইত। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার যোগ্য যে, সর্বাপেক্ষা উচ্চ menhir প্রায়ই এই cromlech-এর নিকটে অবস্থিত। পশ্চিম হইতে পুর্বদিকে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে menhir -গুলির উচ্চতা ক্রমশ কমিতে কমিতে গিয়াছে।

এই প্রকারের প্রস্তরপুজা ও dolmen প্রস্তুতের সময় সঠিক নির্দেশ করা কঠিন, তবে রুজিক্ ও আঁরি দ্য ক্লুজিও অনুমান করিয়াছেন যে, সম্ভবত খৃঃ পূঃ ২০০০ শতাব্দী হইতে খৃঃ পূঃ ৪০০ শতাব্দী পর্যন্ত এই সভ্যতার সময়। বড় বড় menhir-গুলি এই সময়ের মধ্যেই স্থাপিত হয়, ছোট dolmen-গুলির সময় সম্ভবত খৃঃ পূঃ ১০০ শতাব্দীর কাছাকাছি।

ব্রিটানির পল্লীপ্রান্তের নানা প্রাচীন গল্প ও লোকসাহিত্য এইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে। এগুলির সম্বন্ধে নানা কুসংস্কারও প্রচলিত আছে, সন্ধ্যার পর একাকী বড় কেহ এপথে হাঁটিতে চায় না। কার্ণাকের অধিবাসীগণ বলে গভীর রাত্রে বিরাটকার menhirগুলির আড়ালে আলেয়ার মত আলো একবার জ্বলিয়া উঠিতে আবার নিবিতে দেখা যায়। কখনো কখনো এগুলির মধ্যে নানাপ্রকার কুস্বর শুনিতে পাওয়া যায়, অথবা অন্ধকারের মধ্যে কোনো অপরিচিত কণ্ঠের আর্তনাদ পল্লীরজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে শোনা যায়।
[বিবিধ সংগ্রহ, বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৩৬]

বর্তমান আবিসিনীয়া

আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে যে সকল দেশ এখনও অনাবিষ্কৃত আছে বা যেখানে এখনও ইউরোপীয় প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই, আবিসিনীয়া তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। বহু প্রাচীনকাল হইতেই আবিসিনীয়ার নাম ইতিহাসে ও গল্পে সুপরিচিত, কিন্তু সে পরিচয় যতই বিস্তৃত হউক, আবিসিনীয়া দেশের খুব সামান্য অংশের সহিতই সভ্যজগতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। আবিসিনীয়ার মধ্যে এমন সব স্থান এখনও আছে, যেখানে কোনো সভ্যদেশের মানুষ কখনও পদার্পণ করে নাই। আবিসিনীয়ার বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই রহস্যাবৃত ভূভাগ তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়া আসিতেছে, সকল প্রকার বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতেই এই দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতাপ্রিয় শক্তি তাহাদের স্বদেশকে রক্ষা করিয়াছে। আবিসিনীয়ার সীমা অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে সে দেশের গভর্নমেন্টের অনুমতি লইবার প্রয়োজন হয়, ইউরোপীয় কোন গভর্নমেন্টের সম্মতি অসম্মতি সেখানে খাটে না।

আবিসিনীয়ার ইতিহাস ঈজিপ্ট অপেক্ষা কম পুরাতন নয়, কিন্তু ঈজিপ্টের পুরাতন ইতিহাস উদ্ধার করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট উপাদান সে দেশের সর্বত্র ছড়ানো আছে, কিন্তু আবিসিনীয়ার সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। বহু পুরাতন হইলেও এখানে ইতিহাসের কোনো উপাদান পাওয়া যায় না। এরূপ অনুমান করা গিয়াছে যে, অতি প্রাচীনকালে জুডিয়া ও এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম অংশ হইতে এই দেশে একদল লোক আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল, বর্তমান আবিসিনীয়ার অধিবাসীগণ এই প্রাচীন জুডিয়া জাতির বংশধর। কতকাল পুর্বে এই জাতি আবিসিনীয়ায় আসে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন খ্রি পূঃ ৫০০০ বৎসরে এ ঘটনা ঘটিয়াছিল, কেহ আবার এই তারিখ অত্যন্ত কাছাকাছি আনিয়া ফেলিতে চান। বর্তমান আবিসিনীয় জাতির মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তাহারা বাইবেলে বর্ণিত রাজা সলোমনের বংশধর। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই জাতির ভাষা, রীতিনীতি, ধর্ম ও আচার ব্যবহারের কোনই পরিবর্তন হয় নাই, দ্রুতবেগে পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে একমাত্র এই দেশেই অতীতকালের সমুদয় চিহ্ন বজায় রাখিয়া কৌতূহলপ্রদ মিউজিয়মের মমির মত অবস্থান করিতেছে। আবিসিনীয়ার চারিপার্শ্বেই নিগ্রোজাতির বাসস্থান এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া দাসপ্রথার ফলে কিছু নিগ্রোরক্ত যে ইহাদের মধ্যে না প্রবেশ করিয়াছে এমন নয়, কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা নিগ্রো নয় বা এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজস্ব কোনো স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া নিগ্রো আচার ব্যবহারও গ্রহণ করে নাই।

আবিসিনীয়ায় এক ধরনের প্রাচীন সেমিটিক ভাষা এখনও ব্যবহৃত হয়, যদিও প্রদেশ ভেদে ও সামাজিক স্তরভেদে নানাপ্রকার প্রাদেশিক ভাষাও প্রচলিত আছে। আবিসিনীয়ার ধর্মযাজক সম্প্রদায় গিজ্ ভাষা লিখিতে ও বলিতে পারেন বটে, কিন্তু এ ভাষা সাধারণ লোকের কথিত ভাষা নহে।

এদেশের বর্তমান ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হইয়াছে সম্রাট দ্বিতীয় মেনেলিকের রাজত্বকাল হইতে। ইনি **১৮৮৯** খৃষ্টাব্দ হইতে **১৯১৩** খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ কলহ মিটাইয়া বিভিন্ন যুধ্যমান প্রদেশকে একীভূত করেন ও প্রত্যন্ত সীমাস্থ অসভ্য নিগ্রোদিগকে স্ববশে আনয়ন করেন। ইঁহার সময়েই প্রথমে এদেশে রেলওয়ে পত্তন হয় ও নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। কিন্তু গৃহবিবাদের ফলে তাঁহার প্রবর্তিত সংস্কার সকল তাঁহার জীবিতকালে ফলপ্রসূ হয় নাই।

আবিসিনীয়ায় এখনও দাসপ্রথা প্রচলিত আছে। যদিও বর্তমান গবর্নমেন্ট এই কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধনে সচেষ্ট, তবুও এমন মনে হয় না যে, দাসপ্রথা একেবারে দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। বহু শতাব্দীর আচার ব্যবহার, ধর্ম ও প্রবাদের ফলে দাসপ্রথা ইহাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, এখন ইহার মূল উৎপাটন করিতে অনেক সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে হইবে।

আবিসিনীয়ায় বহুকাল পুর্ব হইতেই খৃষ্টধর্ম প্রচলিত আছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশে খৃষ্টধর্ম বিস্তৃত হইবার বহুপুর্ব হইতেই ইহারা খৃষ্টান। ইহাদের ধর্ম খৃষ্টীয় বাপ্‌টিক শাখার অন্তর্ভুক্ত। ঈজিপ্টেই এই শাখার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীতে ঈজিপ্ট হইতে বাপ্‌টিক খৃষ্টধর্ম এদেশে প্রচলিত হয়।

এতকাল ধরিয়া এদেশে যাতায়াতের পথ সভ্যজাতির পক্ষে আদৌ সুগম ছিল না। ইহারা বৈদেশিকগণকে বিশ্বাস করে না, সুবিধা পাইলে মারিয়াও ফেলে। অনেক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এইভাবে বেঘোরে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের প্রধান নগর জিবুটি হইতে আবিসিনীয়ার রাজধানী আদিস্ আবেবা পর্যন্ত ছোট রেলপথ খোলার পর হইতে বৈদেশিকগণের পক্ষে এদেশে ভ্রমণকার্য অনেক সহজ হইয়াছে। আদিস্ আবেবা চতুর্দিকে ক্ষুদ্র পাহাড়বেষ্টিত শহর, জলহাওয়া খুব ভাল, বেশী ঠাণ্ডাও নয়, বেশী গরমও নয়। আদিস্ আবেবার রাজপথে সব রকম পোষাক পরিহিত মানুষই দেখিতে পাওয়া যায়, রক্তবর্ণ ফেজ্ মাথায় আরব হইতে ইহুদী, নিগ্রো, মিসরীয় ও ইউরোপীয় পোষাক পরা শ্বেতকায় ভদ্রলোক পর্যন্ত|

আদিস্ আবেবার রাজপথসমূহ বেশ চওড়া কিন্তু ভারী আঁকা-বাঁকা-শহরও খুব ছড়ানো। অধিকাংশ বাড়ীই খড়ের চাল ও মাটির দেওয়াল, বাজারের মধ্যস্থলে দু'চারখানা টিনের বড় বাড়ী আছে। মোটরগাড়ীর আমদানী নিতান্ত কম নহে, প্রায় তিন চার শত মোটরগাড়ী এক আদিস্ আবেবার রাজপথে দেখিতে পাওয়া যাইবে। তবে ভাল রাস্তা না থাকিবার দরুন মোটরগাড়ীর প্রচলন শহরের বাহিরে এখনও তেমন হয় নাই। ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তুর্কী, ভারতবাসী হিন্দু ও আর্মেনিয়ানই বেশী।

মধ্যযুগ ও বর্তমান যুগ উভয়কেই আদিস্ আবেবার রাজপথে পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে সারি বাঁধিয়া ভারবাহী উষ্ট্র ও অশ্বতরের দল চলিয়াছে, গর্দভবাহিত স্প্রিংবিহীন গাড়ী বিকট আওয়াজে রাজপথ মুখরিত করিয়া চলিয়াছে, অন্যদিকে আবার ফোর্ড মোটরের হর্ন শোনা যাইতেছে। সন্ধ্যার পর কিন্তু রাজপথে লোক চলাচল করিতে পারে না, কারণ পথে আলোর কোনো ব্যবস্থা নাই। পাছে অন্ধকারে চুরি ডাকাতি ও রাহাজানি হয় এজন্য আইনানুসারে রাত্রিতে পথে কেহ বাহির হইতে পারে না। বৈদেশিকগণের সম্বন্ধে এ আইন বলবৎ নয় বটে কিন্তু হিংস্র প্রকৃতির কুকুরের ভয়ে নিতান্ত দরকারী কার্য না থাকিলে কেহই বড় একটা এ সময়ে বাড়ীর বাহির হয় না। নিকটবর্তী পাহাড়সমূহের বন হইতে চিতাবাঘও সময়ে সময়ে রাত্রে শহর পরিদর্শনে আসিয়া থাকে। .

শহরের বাহিরে কাহারও ধনপ্রাণ নিরাপদ নহে। গবর্নমেন্টের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও দেশে পুর্ণ শান্তি নাই, দস্যুদলের উপদ্রব সর্বত্রই অত্যন্ত বেশী। একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে ধনী লোকে সঙ্গে সময়ে সময়ে দুই তিনশত অস্ত্রধারী অনুচর লইয়া চলে, সাধারণ গৃহস্থ শ্রেণীর লোকেও দুই তিনজন লোক সঙ্গে না লইয়া, পথ হাঁটে না। তবে দস্যুরা প্রায়ই বৈদেশিকগণকে কিছু বলে না, কারণ তাহারা জানে ইহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিলে অন্য কোনো গবর্নমেন্টের সহিত রাজনৈতিক গোলযোগে পড়িবার ভয়ে পুলিশ যে কোনো উপায়ে হউক অপরাধীদিগকে বাহির করিবার চেষ্টা করিবে।

আবিসিনীয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। বনাচ্ছাদিত পার্বত্যভূমি, তৃণপুর্ণ উপত্যকা, হ্রদ, নদী, পর্বতকন্দর ও canyon, বড় বড় নির্জন মাঠ—দেশের সর্বত্র এমন ছড়ানো আছে যে কোনো একটা দৃশ্য বেশীক্ষণ দেখিতে হয় না, একঘেয়ে মনে হয় না। আধুনিক সভ্যতা বিস্তার না হওয়ার দরুন চওড়া রাস্তা নাই, মাঠের মধ্যে বেড়া নাই, টেলিগ্রাফ লাইন নাই, গাড়ীঘোড়া নাই—চারিদিকে হাস্যময়ী প্রকৃতির মুক্ত অবাধ লীলা।

[বিবিধ সংগ্রহ, বিচিত্রা, মাঘ ১৩৩৬]